উপসংহার

সময় ও সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় মানুষ স্থিতিশীল হয়েছিল সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে। নিয়মের আবর্তনে যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে কৃষিসভ্যতায় পা বাড়িয়েছিল মানুষ। আচার-সংস্কার, বিশ্বাস, রীতি-নীতি সবকিছু মিলিয়ে সামাজিক অনুশাসনে সময়ের পর সময় ধরে জীবন অতিবাহিত করেছে। শিল্প বিপ্লব, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা গতিশীল জীবনের এই ধারায় এনে দিয়েছে ক্ষমতার মোহ। শ্রেণি বিভক্ত হয়ে পড়েছে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ। এরপরও যে একই সঙ্গে মানুষ ঘর বাঁধতে পেরেছে তাও নয়। বিভক্ত হতে হতে পরমাণুতে পরিণত হয়েও মানুষ স্বস্তি পায়নি। একুশ শতকের সময় ও সমাজে নিঃসঙ্গ, আত্মিক সংকটে দাঁড়িয়ে মানুষ। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার নির্মম উন্নতির ফলে অতীতের সমস্ত বুনিয়াদ যেন মুছে যাওয়ার পথে। পারিবারিক সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িকতা, সম্ভ্রমবোধ, সমস্ত কিছু মিলিয়ে সার্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আগামী দিনগুলোর কথা ভাবলে আঁতকে ওঠে মন, বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে হৃদয়। সময় ও সমাজের এই চলমান জীবনের অবক্ষয়ের পাশাপাশি আত্ম-অনুসন্ধানের এবং ক্রমোত্তরণের পথ খুঁজে নিতে পারি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। কথাসাহিত্য যার অন্যতম শাখা।

গতিশীল জীবনের আধুনিক শিল্প রূপ কথাসাহিত্য। পরিবর্তিত জীবনের বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের সমাজ ও সময় যাদের লেখায় রূপ পেল তাদের অন্যতম একজন রমাপদ চৌধুরী। চোখের দেখা এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের ভাবে-অনুভবে অতীতের জীবন, কিংবদন্তী, নিম্নবিত্তের অতি সাধারণ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতকের শেষদশকের মধ্যবিত্ত জীবনের নানা দিক খুঁজে পাই তাঁর কথাসাহিত্যে। জীবনের অতলে ডুব দেওয়ার অভ্যাসে তিনি আজও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শৈশবের চারপাশ, স্থানীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্য, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী—এসবের অনুসঙ্গে লিখলেন 'প্রথম প্রহর' উপন্যাস। মুক্ত প্রান্তর চাঁদমারির ময়দান, হিজলীর বন, কংসাবতীর তীর, আর তিমুর ঘুড়ি, লাটাই, মার্বেল, লাট্টু খেলার পাশাপাশি বীরবাবটি ধরার আনন্দঘন মুহূর্ত আমাদের নস্টালজিক করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের ছেলেটা,

তিনুর মতো 'প্রথম প্রহরে'র তিমুও পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। কিন্তু শৈশবের এই সবুজ প্রাণের গল্প যে কেবল প্রাণেই থেকে যায় যন্ত্রসভ্যতার কারণে। ফলে যতই পুরোনো তিমুর মতো সবুজ প্রাণ খুঁজে পাই ততই আজকের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি বৈপরীত্যটা আরও কতদূর যেতে পারে। শুধু তাই নয়, সবুজ প্রান্তর থেকে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি পর্যন্ত যখন রেল লাইনে ছেয়ে যেতে লাগল তখন আর বোঝার বাকি থাকে না যে, মানুষ পোষ মানল কী সে। ইংরেজরা প্রথম ভারতবর্ষে রেল লাইন স্থাপন করল। তারপর ক্রমশ মিশে যেতে লাগল ভারতীয় জীবন বিকাশের সঙ্গে। অবশ্য বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা ধর্মীয় গোঁড়ামিকে দূর করে গ্রামীণ ভারতবর্ষের স্থবিরতায় গতি নিয়ে এল। তৎকালীন খড়গপুরে বহুজাতির সমন্বয়ে মিশ্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠল। কিন্তু এই মিশ্রণের মূলে ছিল অর্থ। যে কারণে আত্মিক যোগ গড়ে ওঠার সুযোগ থাকলেও তা কখনও সুস্পষ্ট মাত্রা পায়নি। বরঞ্চ বিচ্ছিন্ন মন ও নিঃসঙ্গতার প্রহর তৈরি হয়েছিল মানুষের ব্যস্ততা এবং যন্ত্রজাগরণের কারণে। ফলে নতুন ও পুরোনোর দ্বান্দ্বিকতায় মানবজীবনের 'প্রথম প্রহর' লিখলেন রমাপদ চৌধুরী। নতুন রেল কলোনি স্থাপন, যান্ত্রিক জীবন এবং অতি সাধারণ দারিদ্রপূর্ণ মানুষের কথকতার মধ্য দিয়ে আমরা ফিরে যাই যন্ত্রসভ্যতার স্বার্থসিদ্ধির প্রথম প্রহরে।

সদ্য হয়ে ওঠা রেলশহরের বড়বাজারে পার্শ্ববর্তী গ্রামের দরিদ্র চাষী মানুষেরা যৌবনের রমাপদ-র কাছে একসময় কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সেই উদ্যমে তিনি গ্রাম জীবনে অনেক সময়ও অতিবাহিত করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা এবং যৌবনের আকর্ষণে তাঁর কলমে উঠে এসেছিল 'বনপলাশীর পদাবলী'। শৈশব বিজড়িত পুরোনো গ্রাম যে আর আগের অবস্থানে নেই 'বনপলাশীর পদাবলী' তার দলিল। লেখক দেখিয়েছেন গ্রাম জীবনের ক্রমশ ভাঙন। পল্লীর সেই শান্ত স্নিগ্ধ জীবন আর নেই। গ্রামজীবনও হয়ে উঠেছে অশান্ত, অস্থির। আর্থিক সংকট, শহরের হাতছানি গ্রামের মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে সমর সেনের 'নিরালা' কবিতার কথা—

''নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহে,

শেয়াল-সংকুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়েঘর বাঁধি;
গোরুর দুধ, পোষা মুরগির ডিম, খেতের ধান;
রাত্রে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান;
সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুরুরে
গোরুর মতো করুণ চোখ
বাংলার বধূ নামে;
নিরালা কাল আপন মনে
পুরোনো বিষণ্ণতা হাওয়ায় বোনে।"

কবি ভেবেছিলেন শহরের কোলাহল মুখর জীবন থেকে নিভৃত গ্রামের নিরবতায় কিছুটা সময় কাটাবেন। কিন্তু গ্রামে পৌঁছে তার স্বপ্নভঙ্গ হল। কেননা সেই গ্রাম আর নেই, যেখানে শান্তির নিঃশ্বাস নেওয়া যেতে পারে। ফলে বনপলাশীর ভবিষ্যৎ কী তা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে কাল্পনিক হলেও বাস্তবজীবনের সমস্যা রূপায়ণে 'বনপলাশির পদাবলী' সার্থক রচনা হয়ে ওঠে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের শহরমুখী হওয়ার কারণ যেমন আর্থিক সংকট কিংবা গ্রামের কৃষিকাজে মন বসাতে না পারা তেমনি মধ্যবিত্ত মানুষ শিক্ষা ও আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়াতে শহরের দিকে ছুটেছে। ফলে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির ভাঙন, যৌথ পরিবারের দুর্দশা ও দরিদ্র মানুষের বাস্তব দিক উঠে আসে 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসে।

শৈশব ও কৈশোরের ভাববিহ্বল মন চাঁদমারির মাঠ, হিজলীর বনে সামান্য সময়ের ঘুরে বেরানোর সঙ্গী হয়তো জুটেছিল। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠার মতো কেউ জোটেনি, কেবল যাপিত জীবন নয় লেখার জীবনেও এই অন্তরঙ্গতা হয়ে ওঠেনি লেখকের। ফলে বনপলাশির গ্রাম থেকে শহরে এসে নতুন উদ্যমে মধ্যবিত্ত জীবনে সম্পূর্ণতই ঢুকে পড়লেন এবং সচেতনভাবেই তাঁর কলমে উঠে এল মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন বৃত্তান্তের 'খারিজ'। পালানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জয়দীপের মতো দু'শো টাকার চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত ছোট্ট একটি পরিবারের কাহিনিকে তুলে ধরেছেন

ঔপন্যাসিক। এক্ষেত্রে বাড়ির মালিক রায়বাবু, ভাড়াটে জয়দীপ পরস্পরের শত্রু হলেও আত্মরক্ষার কারণে এক হয়ে যায়। কিন্তু মধ্যবিত্তের এই সংখ্যাবৃদ্ধি জয়দীপকে বাইরের দিক থেকে আপাত স্বস্তি দিলেও অপরাধ বোধ থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। সে উপলব্ধি করে যে এই ফাঁকি আসলে পালান কিংবা অন্য কারো কাছে নয়, এই ফাঁকি শেষ অবধি একান্তই তার নিজের। এও একধরনের ক্রাইম। এই অনুভূতি আরও গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে টুকাইয়ের 'হোয়ের ইজ দা গার্ল নাও' অন্বেষণের মধ্য দিয়ে। মধ্যবিত্ত জয়দীপের আত্মপ্রতারণা এবং নিষ্ফল আত্ম পরিত্রাণের উপন্যাস হয়ে ওঠে 'খারিজ'। মধ্যবিত্তের এমন ক্রিমিনাল মানসিকতার জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসা একটি অপ্রকৃতিস্থ মেয়ে বাপের বাড়িতে সমস্যা হয়ে ওঠে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি মেয়েদের আসল বাড়ি হয়ে ওঠে। জন্মদাতা পিতা মাতার বাড়ি হয় পর। হাজার বঞ্চনা, অপমান এবং সর্বাবস্থায় সবকিছু সহ্য করে থাকা মেয়েদের কর্তব্য বলে মনে করে আমাদের সমাজ। তার সুবিধে-অসুবিধে, মেনে নেওয়া না নেওয়ার সম্ভাবনাও যে কীভাবে দূরীভূত হয় তা বলা কঠিন। যাই হোক, এমনই সমস্যামুখীন বিবাহিতা নারী রেণু শ্বশুরবাড়িতে থাকতে না পারার দরুণ বাড়িতে চলে আসে। কিন্তু বাড়ির লোকেরা প্রথম কয়েকদিন মেনে নিলেও পরবর্তীতে আর মেনে নিতে পারে না। রেণুর সমস্যা তাদের কাছে লজ্জার হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী লোকের কাছে তার বাড়ির লোকেরা এই বিষয়টি তাই গোপন করে। তার প্রিয় মনুদা, আসলে যাকে গোপন ভালোবাসার কারণে যার এই পরণতি সেই মনুদাও সবার থেকে এই বিষয়টি আড়াল করতে চায়। আড়াল করতে চায় রেণুকেও। 'লজ্জা' উপন্যাসে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। রেণুর পরিবারের সকলে যেন তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারে না। এও তো একধরনের ফাঁকিই বটে। শুধু তাই নয়। রেণুর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার আসল কালপ্রিট যে অনিমেষ সেও তার সমস্যার কথা বুঝতে পেরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে তাকে পাগলাগারদে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

'খারিজ'-এর জয়দীপ এবং 'লজ্জা'-র অনিমেষ আলাদা হলেও মধ্যবিত্তের মানসিকতায় তারা তো একই। তবে ঔপন্যাসিক জয়দীপের মধ্যে যেভাবে আত্মবিশ্লেষণের দিকটিকে তুলে

ধরেছেন অনিমেষের ক্ষেত্রে তার অনেকটা কম নজর দিয়েছেন বলা যেতে পারে। তবে রেণুর পরিবারের মতো অনিমেষের মধ্যেও নিরাপত্তাবিলাসী মধ্যবিত্তেরই প্রতিফলন ঘটে। যা জয়দীপ, অনিমেষ নয় মানবজীবনের এমন চরিত্রগুলিরও লজ্জাই বটে।

'খারিজ' উপন্যাসে পালানের মৃত্যুতে জয়দীপের আত্মিক সংকট, 'লজ্জা'য় অপ্রকৃতিস্থ রেণুকে নিয়ে তার পরিবারের লোকের পাশাপাশি অনিমেষের পলায়নবৃত্তি আমাদের আরেক উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয়, সেটি হল 'হৃদয়' উপন্যাস। অবশ্য 'খারিজ' ও 'লজ্জা' উপন্যাসের তুলনায় 'হৃদয়' উপন্যাসের সমস্যা অনেকটাই সাধারণ মনে হয় আমাদের। নীতিবাগিশ, প্রাচীনপন্থী নামহীন একজন পিতা স্বপ্ন দেখেছিল পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুখে সংসার চালিয়ে নেবে। ছেলে মেয়ে মিলে একটি সুখী পরিবার কিন্তু চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তার এই স্বপ্ন ক্রমশ ভেঙে যেতে লাগল। তারই চোখের সামনে সন্তানেরা একে একে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে লাগল। সংসারের সর্বময় কর্তার প্রতি এখন আর কারো তেমন নজর নেই। তাই হৃদরোগে আক্রান্ত হলে বুকে পেসমেকার বসানোর অর্থসংকট ঘনিয়ে আসে। যে পিতা চিরকাল সার্বিক সুখের স্বপ্ন দেখেছিলেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ছেলেদের সুখের জন্য সবকিছু ছেড়ে দিতে দিতে নিজে কী পেলেন। পরিবর্তে আঘাতে আঘাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করলেন। কিন্তু এরপরেই কী সন্তানেরা সুখী হতে পেরেছে! পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন থেকে আলাদা কিংবা দূরে গিয়ে বসবাস করলেই কী সুখী হওয়া যায়! হয়তো অর্থ থাকলে বিলাসবহুল জীবন কাটানো যায়, কিন্তু প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হৃদয়হীনতার পরিচয় ফুটে ওঠে 'হৃদয়' উপন্যাসে। যেখানে স্নেহ, ভালোবাসা শুধু প্রয়োজনের নিরিখেই গড়ে ওঠে। প্রয়োজনের বাইরে রক্তের সম্পর্কের পরিবারের এই শ্রীহীন অবস্থা আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে। তবে এতো গেল নিজেরই পরিবার কেন্দ্রিক সম্পর্কের মেনে নিতে না পারার দিক। আবার এমন সমস্যা কেন্দ্রিক না হলেও কিছুটা তার বিষয়কে ছুঁইয়ে যায় 'বাহিরি' উপন্যাসের কথকতা। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধি সুধাময়, দয়াময়ীরা পথের ছেলেকে তুলে এনে লালন পালন করতে চেষ্টা করেন। প্রয়োজনে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টাও করেন।

কিন্তু শেষমেষ তাদের বাহিরি করেই রেখে দেন। কেননা তাদের সমকক্ষ কিংবা তাদের থেকে ওপরে উঠতে দেওয়ার পক্ষ নেওয়া মধ্যবিত্তের আদতে নেই। ফলে তারা বংশীকে সমান ভাবলেও বংশী যেন তাদের সমান ভাবতে পারবে না। আর সুধাময়রা তাকে যে সমকক্ষ ভাবে এটা যেন তাদের মহানুভবতা। কাজেই ভালোমতো লেখাপড়া করে একসময় ভালো চাকরি পাওয়া বংশীর যেন কোথাও আত্মিক বন্ধনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভিখিরি বংশী, সুধাময়, সঞ্চয় কিংবা শুভার কাছে বাহিরি হিসেবেই থেকে যায়। আবার প্রসঙ্গক্রমে এও মনে রাখা দরকার যে, ভিখিরি ছেলে হলেও অর্থের বিচারে বংশীও কিন্তু ততদিনে মধ্যবিত্তের ঘরানায় স্থান পেয়ে যায়। কেননা আজকের পৃথিবীতে উচ্চ, মধ্য, নিম্নের ব্যবধানও তো প্রতিপত্তির বাটখারায় মাপা এক মানসিকতার নামান্তর। অবক্ষয়ী আধুনিকতার এই সামাজিক সংকট আসলে উত্তরণের দিশাও বটে। সমস্যার বিশ্লেষণ সমাধানের মূল হাতিয়ার। সেইদিক থেকে রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস আমাদের জীবনে চলার পথে মানবিক হয়ে উঠতে সাহয্য করে।

উপন্যাসের মতো তাঁর লেখা ছোট গল্পগুলিও বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্য। বাংলা বিহার সীমান্ত অঞ্চল সহ অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে অনেকসময় অতিবাহিত করার কারণে 'বনপলাশীর পদাবলী', 'লালবাঈ' উপন্যাস লেখা সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। গল্পের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। 'দরবারী', 'রেবেকা মোরেনের কবর', 'ঝুমরা বিবির মেলা' কিংবা 'সতী ঠাকুরুনের চিতা'-র মতো গল্পগুলি আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। স্থানীয় জনশ্রুতি ও লোকজীবনের আদল থেকে রসদ নিয়ে লিখলেন 'দরবারী' এবং 'রেবেকা মোরেনের কবর'। দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-মিলনের আখ্যান হয়ে ওঠে গল্পগুলি। অন্যদিকে ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঝুমরা বিবির মেলা বসায় সন্তানের পিতা। ছেলে ভালো হয়ে যাবে এই বিশ্বাসে শীতের মরশুমে মেলা। সংস্কার-বিশ্বাসের যাবতীয় ভাবনায় বিষয়ের দিক থেকে অলৌকিক মনে হলেও বিশ্বাস ও বিশ্বাস ভঙ্গে সন্তানের কারণে পিতার আত্মবলিদানের স্পর্শকাতর গল্প হয়ে ওঠে 'ঝুমরা বিবির মেলা'। স্থানীয় নাচগান, মোরগ লড়াই, মালায় সাজানো নানা সামগ্রীতে পূর্ণ মেলায় স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়ে ওঠে গল্পটি। 'ঝুমরা বিবির মেলা'র মতো স্থানীয় লোক ঐতিহ্য নিয়ে লেখা 'সতীঠাকুরুনের চিতা' গল্পটিও

পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, স্থানীয় এইসব লোকসমাজের মধ্য দিয়ে আমাদের ভিন্ন ভাবনার ক্ষেত্রে নিয়ে যান গল্পকার রমাপদ চৌধুরী তাঁর অন্যতম গল্প 'ভারতবর্ষ'-এর মধ্য দিয়ে। স্বাধীন মাহাতোদের ভিক্ষাবৃত্তি এবং তাদের প্রতি বিদেশি সৈন্যদের অপমানজনক সম্বোধনে লেখক দেখাতে চেয়েছেন এই অপমান গোটা ভারতবাসীর অপমান।

অতি সাধারণ স্থানীয় নিম্নবিত্তের জীবন সংস্কৃতির পাশাপাশি গল্পের মধ্যেও মধ্যবিত্ত জীবনের কথা উঠে এসেছে নানাভাবে। আর এটাই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। উপনাসের মতো গল্পের ক্ষেত্রেও মধ্যবিত্ত জীবন বিষয়ের কেন্দ্রে উঠে আসে। 'ড্রেসিং টেব্‌ল', 'আলমারিটা', 'ফ্রীজ', 'বসবার ঘর', 'ডাইনিং টেব্‌ল' গল্পগুলি তারই পরিচায়ক। গল্পের নামকরণেই আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবন জড়িয়ে যায়। মানবিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের পণ্যমনস্কতা গল্পগুলির বিষয় বৈচিত্র্যকে নতুন মাত্রা দান করে। ফলে বিংশ শতকের শেষ দশক থেকে আজকের একবিংশ শতকে পৌঁছে মধ্যবিত্ত জীবনের ঘনিয়ে আসা নতুন সংকট রমাপদ চৌধুরীর কথাসাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে উঠে আসে। এ সংকট আসলে উত্তরণের দিশাও বটে। আখ্যানের মধ্য দিয়ে সমস্যার সম্মুখীন এবং আত্মবিশ্লেষণে সমস্যার অনুধাবনের প্রচেষ্টায় জীবনে চলার পাথেয় হয়ে ওঠে রমাপদ চৌধুরীর কথাসাহিত্য। পুঁজিবাদ ও যন্ত্রসভ্যতার সময় পরিসরে মানব সমাজের মানবিক হয়ে ওঠার গল্পকথা রমাপদ চৌধুরীর প্রতিটি গল্প ও উপন্যাস। নিরলসভাবে এই জীবনবোধে আজও কথাসাহিত্যের মালা গেঁথে চলেছেন আমাদের জন্যে। রমাপদ চৌধুরীর কথাবিশ্বের স্বরূপ সন্ধানে আমরা এভাবেই সমাজ, সময় ও মধ্যবিত্তের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংকট ও বিচ্ছিন্নতার বহুকৌণিক মাত্রাগুলোকে আলোচ্য সন্দর্ভে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। উপসংহারে আমাদের গৃহিত সিদ্ধান্তকে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি।